পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে আমেরিকান ভোটারদের সচেতনতা বাড়ছে

স্টিফেন কফম্যান
ইউএসইনফো স্টাফ রাইটার

ওয়াশিংটন, ১৬ই সেপ্টেম্বর -- নির্বাচনে একজন প্রার্থী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিভাবে কাজ করবে অর্থাৎ আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতি কি হবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক আমেরিকানই এখন মাথা ঘামান এবং বিষয়টি তাদের ভোট দানের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। এমন এক সময়ে পররাষ্ট্র নীতির বিভিন্ন বিষয়ের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব সামনে আসছে, যখন বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক ইতিহাসে আমেরিকার ভোটাররা সবচেয়ে বেশি মেরুকরণের শিকার।

ডেভিসে অবস্থিত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মিরোস্লাভ নিনচিচ্ বলেন, যদিও দীর্ঘদিন ধরেই মনে করা হয়েছে যে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি নিয়ে আমেরিকান ভোটাররা কিছুই বোঝে না বা এ নিয়ে তারা চিন্তিত নয়, কিন্তু "ভোটারদের বড় একটা অংশের মধ্যেই পররাষ্ট্র নীতি যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, যা নির্বাচনের ফলাফলেও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে।"

'পররাষ্ট্র বিষয়াবলি ও নির্বাচনী সংযোগ' শীর্ষক তার একটি নিবন্ধ 'ইউজিন উইটকফ' এবং জেমস ম্যাককরমিকের 'দ্য ডোমেস্টিক সোর্সেস অব অ্যামেরিকান ফরেন পলিসি' নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এতে তিনি আমেরিকান ভোটারদের প্রভাবিত করে এমন বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে দেখান যে, ২০০০ সালে যেখানে ১০ শতাংশ ভোটারের কাছে পররাষ্ট্র নীতি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেখানে ২০০৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ভোটদানের ক্ষেত্রে পুরোপরি অর্ধেক ভোটারই পররাষ্ট্র নীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে গণ্য করেন। এ সময়ে ভোটারদের উদ্বেগ ছিল সন্ত্রাসবাদ ও ইরাক পরিস্থিতি নিয়ে।

নিনচিচ্ মন্তব্য করেন যে ১৯৬৮ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হয় খুব অল্প ব্যবধানে। ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে প্রাপ্ত ভোটের গড় ফারাক হয় শতকরা ৭.৭ ভাগ। তিনটি নির্বাচনে ভোটের ব্যবধান হয়েছিল ৩ শতাংশেরও কম। এসব পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ২০০০ সালের ভোটের সময় সেই ১০ শতাংশও চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তিনি বলেন, "এর অর্থ হল পররাষ্ট্র বিষয়াবলি জয়-পরাজয়ের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে, কারণ যেসব ভোটার পররাষ্ট্র নীতিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে না, তাদের কাছেও প্রায়ই এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় এবং ভোটদানের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে।"

ইউএসইনফোর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে নিনচিচ্ বলেন, বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আমেরিকার অব্যাহত প্রভাব ও গুরুত্ব সত্ত্বেও প্রতিদিনকার পররাষ্ট্র বিষয়াবলি ও বিভিন্ন দেশের নামধাম সম্পর্কে আমেরিকান নাগরিকদের সীমিত ধারণা দেখে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মাথা খারাপ করার দরকার নেই।

তিনি বলেন, অনেক আমেরিকানই নিজের দেশের রাজনীতি সম্পর্কেও অজ্ঞ। "সুতরাং আপনি যখন পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে কথা বলেন, তখন অজ্ঞতা কিছুটা বেশি হবেই, তবে এটা মাত্রার ব্যাপার, প্রকারের নয়।"

নিনচিচ্ বলেন, যে সময় ক্রমবর্ধমান হারে আমেরিকান ভোটাররা ভোটদানের সময় পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত বিষয়গুলো মাথায় রাখে, সে সময় জনগণ এসব বিষয় কিভাবে মোকাবেলা করবে এবং বিশ্ব দরবারে মার্কিন স্বার্থকে কিভাবে এগিয়ে নেবে তা নিয়ে বিভক্তও হয়ে যায়।

যুক্তরাষ্ট্র কেমন নীতিমালা অনুসরণ করবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ মনে করেন প্রাথমিক স্বার্থসিদ্ধি করতে কিংবা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে নেবার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের এক-পাক্ষিক অথবা বহু-পাক্ষিক উপায় অবলম্বন করা উচিৎ। কেউ মনে করেন, এ ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র নীতির অগ্রাধিকারমূলক পন্থা হিসেবে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ করা উচিৎ, আবার কারো মতে কূটনৈতিক পন্থাই ভালো।

নিনচিচ্ বলেন, ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান ভোটার ও প্রার্থীদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি অনুমান করা যায় না... আজ থেকে ৩০/৪০ বছর আগে বা স্নায়ু-যুদ্ধের সময় বৈদেশিক নীতি প্রশ্নে দলীয় পক্ষপাত যতটা কম ছিল, এখন তেমনটি খুব কমই লক্ষ্য করা যায়।

তিনি শিকাগো কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস্ কর্তৃক পরিচালিত নিয়মিত জরিপের ভিত্তিতে উপসংহারে পৌঁছান। ওই জরিপে দেখা যায়, কোন একটি দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে বড় ধরনের ব্যবধান রয়েছে। তিনি বলেন, "এই ব্যবধান সম্ভবত উদার ও রক্ষণশীল রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মৌলিক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বড় ধরনের পার্থক্য থেকে উৎসারিত হয়েছে।"

নিনচিচ্ বলেন, "জাতীয় জরুরি অবস্থা বা প্রাকৃতিক জরুরি অবস্থায়" দলীয় পক্ষপাত দুর হয়ে যায়, অর্থাৎ সে সময় সবাই একই পতাকা তলে সমবেত হয়। কিন্তু তিনি এও বলেন যে, মারাত্মক হুমকিমূলক

পরিস্থিতি খুব সাধারণ ঘটনা নয়, আর এ ধরনের পরিস্থিতিতে যে দলীয় পক্ষপাত দুর হয়ে যায়, সে অবস্থাও বেশিদিন স্থায়ী হয় না।

নিনচিচের মতে, ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউ ইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে সন্ত্রাসী হামলা সত্ত্বেও "আমেরিকান জনগণের দৃষ্টিতে সন্ত্রাসবাদই সম্পূর্ণ হুমকি নয়", যে অর্থে স্নায়ু যুদ্ধের সময় কম্যুনিজমকে দেখা হত। তিনি যুক্তি দেন যে, অধিকাংশ আমেরিকানই "আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম ও পরমাণু অস্ত্রকে যত বড় হুমকি হিসেবে গণ্য করত, সন্ত্রাসবাদকে ততটা হুমকি হিসেবে গণ্য করে না"।

তিনি বলেন, সন্ত্রাসবাদের হুমকির গুরুত্ব নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে মতভিন্নতা "রাজনীতিবিদদের আগের চেয়ে বেশি বাগাড়ম্বের সুযোগ করে দিয়েছে। আমেরিকার জনগণ চেয়েছে বলেই যে আমেরিকার পররাষ্ট্র নীতির মেরুকরণ হয়েছে তা নয়, বরং নেতারাই জনগণকে মেরুবদ্ধ করেছে।"

==========

**(ইউএসইনফো যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্‌স-এর একটি প্রকাশনা। ওয়েবসাইট: http://usinfo.state.gov)*

জিআর/ ২০০৭

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার'-এর প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮৩৭১৫০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *ওয়েবসাইট: dhaka.usembassy.gov) যোগাযোগ করুন।*